।। ভূমিকা ।।

প্রেম যে কেমন
কামড়ে দেখার ছুঁয়ে দেখার ছেনে দেখার
বুকে পেষার জন্য, বড়ো কষ্ট হল।
প্রেমের জন্য বুকের মধ্যে কষ্ট হয়ে
প্রেম কি হল?
বুকের ভেতর প্রেম এল না,
প্রেম এল না, দুঃখ এল।

— *প্রেম এল না*, কবিতা সিংহ

প্রেমের খোঁজ নিরন্তর। কত জন্ম বয়ে যায় নদীর ধারার মতো, কত চিতা জ্বলে নেভে, কত গল্প মুছে যায় কালের স্রোতে, লেখা হয়ে চলে নতুন কাহিনি। তবু সেই খোঁজ শেষ হয় না। প্রেমিক জন্মজন্মান্তরে খুঁজে ফেরে প্রেম। কত জীবন ফুরায়, কত শিশু বৃদ্ধ হয়। তবু খোঁজ চলে। সেই প্রেমের তৃষ্ণা মেটে না। সে নারীকে ছোঁয়া হয় না। সেই পুরুষ শুধু স্বপনচারীই রয়ে যায়।

প্রেমের গল্প লেখা বড়ো কঠিন। প্রেমের গল্পরা নিজেরাই নিজেদের গল্প বলে চলে। আসলে প্রেমের কোনো গল্পই হয় না। প্রেমকে অক্ষরে ধরে, সাধ্য কী লেখকের! গল্প হয় জীবনের। সেই গল্পে প্রেম ছোঁয়াচ রেখে চলে। জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি জীবন বয়ে চলে। সেই জীবন সম্পর্কের কথা বলে, বিশ্বাসের গান গায়, অন্য জীবনের হাতে হাত রাখে। সেই স্পর্শটুকুই পরম সত্য। সেই গানের সুরটুকুই অনুরণন তুলে চলে বাকি জীবন ধরে। তা ছাড়া বাকি আর কোনোকিছুই সত্যিকারের প্রেমের গল্প নয়। আসলে প্রেম বাঁচে মুহূর্তে। জীবন তো নদীর মতো। সেই জীবনের গল্পের স্রোতে প্রেমের কণারা মিশে থাকে। কেউ দেখে, কেউ দেখে না। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। সূর্যের আলো পড়লে সেই প্রেমেরা ঝিকমিকিয়ে ওঠে। বলে, "আমি আছি।"

প্রেমের কোনো পরিণতি হয় না। প্রেম এক যাত্রা, অনুভবের পথ চলা। প্রেমাস্পদকে বুকের গহনে অনুভব করা, করে চলাতেই প্রেমের মাধুর্য। প্রেমের আনন্দ, প্রেমের যন্ত্রণা জুড়ে থাকে একটা গোটা জীবন। আমার গল্পরাও তাই জীবনে মিশে থাকে। আমি জীবনের গল্প আঁকতে চেয়েছি বারবার। মানুষের গল্প লিখেছি। তারপর লেখা শেষে কলম বন্ধ করে দেখি, গল্পের তলদেশে তিরতির করে বয়ে চলেছে ভালবাসার সুর। সেই ভালবাসার কত বর্ণ, কত রং, কত রূপ! অবাক হয়ে ভেবেছি, তা-ই তো! জীবনের গল্প বলতে বসে কখন প্রেমের গল্প বলেছি, নিজেই জানতে পারিনি।

গল্পগুলো জমছিল। তারপর যখন দুই মলাটে আনার কথা উঠল, অবাক হয়ে দেখলাম এতগুলো প্রেমের গল্প লিখে ফেলেছি! অবশ্য সত্যিই এগুলিকে

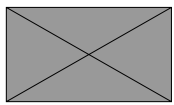

প্রেমের গল্প বলা যায় কি না তার বিচার পাঠক করবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, প্রেমের পরিচিত রূপের বাইরেও অনেক রূপ হয়। নারী-পুরুষের চেনা আকর্ষণের বাইরেও হয় কত অচেনা রসায়ন। আমি সেইসব চেনা-অচেনা অনুভূতির ছবিই আঁকতে চেয়েছি এই সংকলনে।

আরও অনেকের কথা বলা বাকি রয়ে গেল। রয়ে গেল আরও অনেক ভালোবাসার গল্প। সেগুলো আমার মনে চিরভাস্বর হয়ে থাকুক। হয়তো আবার কোনোদিন অন্য কোনো সংকলনে লিখব তাদের কথা। আমার খুব প্রিয় একটা কবিতা দিয়ে শেষ করছি। ব্রিটিশ কবি জন ডানের *দ্য ক্যাননাইজেশন* কবিতার এই পংক্তিগুলো খুব প্রিয় আমার।

For God's sake hold your tongue, and let me love,
Or chide my palsy, or my gout,
My five gray hairs, or ruined fortune flout,
With wealth your state, your mind with arts improve,
Take you a course, get you a place,
Observe his honor, or his grace,
Or the king's real, or his stamped face
Contemplate; what you will, approve,
So you will let me love.

সংকলনের নামটি ধার নিয়েছি কবি চণ্ডীদাসের থেকে। সেই মহান প্রেমের কবিকে প্রণাম জানাই। অলমিতি বিস্তারেণ।

সোমজা দাস
১ এপ্রিল, ২০২৪
কৈখালি, কলকাতা

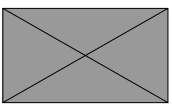

সূ চি প ত্র

দ্বিধা ৯
সাহসী ১৬
প্রজাপতির নির্বন্ধ ২৫
স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম ৩১
বাণীমামি ৩৯
কেতকীর দুই প্রেমিক ৪৫
মানসী ৫৩
ভুল অঙ্ক ৬১
নিকষিত হেম ৭১
হার মানা হার ৭৮
অদিতি জোশির প্রেমিক ৮৪
নামে কী বা করে ৯০
স্বরচিতা ৯৬
ইরাবতী ১০৪
নাঙ্গেলি ১১৫
অপবাদ ১২৪
জাতিস্মর ১৩১
বেগমসাহিবার কোঠি-হাভেলি ১৩৭

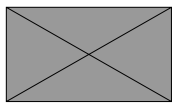

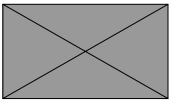

দ্বিধা

অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে সাতটা বেজে যায় রোজ। সাতটা পাঁচের বাসটা মিস হয়ে গেলে আরও আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় শিবানীকে। আগের অফিসের সামনেই মেট্রো ছিল। সোজা দমদমে পৌঁছে ট্রেন ধরে নিলে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারত।

নতুন চাকরিতে মাইনে কমেছে, বেড়েছে কাজের চাপ। শিবানীর মতো পঁয়ত্রিশ পেরোনো খুব সাধারণ চেহারার শ্যামলা মেয়ের জন্য দুনিয়াটা খুব একটা সহজ নয়। পরিশ্রম করে দু'পা এগোতে চাইলে রূপের অভাব তাকে চার পা পেছনে ঠেলে দেয়। যখন প্রথম চাকরিতে জয়েন করেছিল, বয়সের চটক ছিল; রিসেপশনের কাজ চালাতে অসুবিধে হয়নি। সময় বদলেছে। অফিস ও বাড়ির যুগপৎ পরিশ্রমে সেই কম বয়সের শ্রীটুকু অন্তর্হিত হতে সময় নেয়নি। ফলে নতুনকে জায়গা ছেড়ে দেওয়াটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

জন্ম থেকেই শিবানীর ডানপায়ের চেয়ে বাঁ পা-টা সামান্য ছোটো। তাতে অবশ্য তার হাঁটাচলায় অসুবিধে হয় না। সামান্য খুঁড়িয়ে হলেও অনেকের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত হাঁটতে পারে। ন'টার মধ্যে বাড়ি না ঢুকলে বউদির মুখে আঁধার নামে। ভুরুদুটো কাছাকাছি ঘনিয়ে আসে। কোনোরকমে বাইরের শাড়িটা ছেড়ে হাত-পা ধুয়েই রান্নাঘরে সেঁধিয়ে যায় শিবানী। অভ্যস্ত হাতে দ্রুত রুটি বেলতে থাকে। অন্য হাতে গরম চাটুতে সেগুলো মেলে দেয়। রুটি সেঁকতে থাকে, লালচে হয়ে ফুলে ওঠে। আগুনের আঁচে শিবানীর মুখটা গনগন করে। মনে হয় যেন যে-কোনো মুহূর্তে জ্বলে উঠবে দাউদাউ করে। কিন্তু জ্বলে না। আজ অব্দি জ্বলেনি। শিবানী জানে তাদের মতো মেয়েদের জ্বলে উঠতে নেই।

।। দুই ।।

বাস থেকে নেমে কবজি উলটে ঘড়ি দেখল শিবানী। পৌনে ন'টা বাজে। বাজারটা পেরিয়ে আজ রিকশা নিয়ে নেবে। তাতে দশটা টাকা বেরিয়ে যাবে বটে, কিন্তু মাঝেমধ্যে সংসারের ইঞ্জিনে এই অতিরিক্ত তেলটুকু না ঢাললে শান্তি বজায় রাখা দায় হয়।

আজ একটু বেশিই দেরি হয়ে গেছে। সাতটা পাঁচের বাসটা মিস করেছে নিজের দোষে। অফিস থেকে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিল। সহকর্মী পিয়াসী খুব করে ধরল একটা লিপস্টিক কিনতে যাবে বলে। সে নিজে রং বোঝে না। তাই শিবানীকে রং পছন্দ করে দিতে হবে। পিয়াসীর লিপস্টিক কিনতে গিয়ে একটা নেলপলিশ ভারি পছন্দ হয়ে গেল শিবানীরও। বেশ কিছুদিন আগে রংটা দেখেছিল বউদির বোনের নখে। বউদিও খুব প্রশংসা করছিল। নিজের জন্য কখনও কিছু কেনা হয় না। আজ আর লোভ সামলাতে পারেনি। কড়কড়ে নগদ আশি টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে নেলপলিশটা। এখন অনুশোচনা হচ্ছে। না কিনলেই হত। থাক, নিজেই ভাবে শিবানী। রোজ তো আর নিজের শখ-আহ্লাদকে প্রশ্রয় দেয় না সে। একদিন না হয় একটু বেহিসাবি হলই। কিনে যখন ফেলেইছে, থাক। যত্ন করে রাখলে অনেকদিন চলবে।

বাজার পেরিয়ে শিবানী দেখল রিকশা-স্ট্যান্ড ফাঁকা। শাড়ির আঁচল দিলে কপাল-গলার ঘাম মুছে এদিক-ওদিক তাকাল অসহায় দৃষ্টিতে। পাশেই বস্তার ওপর বকফুল বিছিয়ে বিক্রি করতে বসেছে এক বুড়ি। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, রিকশাওয়ালাদের ইউনিয়ন কীসব দাবি-দাওয়া নিয়ে আজ ধর্মঘট ডেকেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিবানী। আজ বাড়িতে অশান্তি হবে। বউদিকেও দোষ দেয় না সে। নিজের জন্য একটা সাজানো-গোছানো সংসারের স্বপ্ন তো সব মেয়েই দেখে। শিবানীও দেখেছিল একদিন। সে-সব যেন কোন বিস্মৃত অতীতের কথা বলে বোধ হয় এখন। বউদি এমনিতে ভালো মেয়ে। কিন্তু মাথার ওপর অবিবাহিত ননদকে সারা জীবন বইতে হলে কার আর ভালো লাগে! তা-ও শিবানী বেতনের টাকার সিংহভাগ বউদির হাতে তুলে দেয় বলে মাথার ওপর ছাদটা এখনও বজায় আছে।

অপেক্ষা করে লাভ নেই। দ্রুত পায়ে হাঁটা লাগাল শিবানী। আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার আলোটা ঝুপ করে নিভে গেল। লোডশেডিং, গত

ক'দিন ধরে রোজই এই সময়ে হচ্ছে। ইশ্, প্রসাধনীর দোকানে দেরি না করলে লোডশেডিং-এর আগেই বাড়িতে ঢুকে যেতে পারত। কয়েক পা এগিয়ে বামদিকে বাঁক নিতেই পেছনে সাইকেল রিকশার প্যাঁকপ্যাঁক শব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কাছে আসতেই বুঝল রিকশাটা খালি। হাত তুলে দাঁড়াতে ইশারা করল শিবানী। ঠিক সেই মুহূর্তে টের পেল এই সবেধন নীলমণি একটিমাত্র রিকশার দাবিদার সে একা নয়। রিকশার পেছনে অন্ধকারে "এই দাঁড়াও দাঁড়াও" বলে ছুটে আসছে কেউ।

।। তিন ।।

রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার সামনের দিকে, একবার পেছনদিকে তাকাল। ততক্ষণে পেছনের ব্যক্তিটিও সামনে এসে পড়েছেন।

"বিশ্বাসপাড়া যাবে, ভাই?"

আশেপাশের কয়েকটা বাড়ি থেকে ইনভার্টারের বৈদ্যুতিক আলো রাস্তায় এসে পড়েছে। সেই আবছা আলোয় সামনের মানুষটিকে চিনতে অসুবিধে হল না শিবানীর। মুহূর্তে বুকের ভেতর একটা প্রবল ভূমিকম্প ঘটে গেল। নিজেকে সামলে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

"এই দিদি আগে ডাকলেন", বলল রিকশাওয়ালা।

সামনের ব্যক্তিটি এবার শিবানীর মুখের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই বিস্ময়মথিত কণ্ঠে বলে উঠল, "আরে, শিবানী না?"

ভাগ্যিস এখানে আলো নেই। লোডশেডিংকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল শিবানী। নইলে অনিরুদ্ধদার সঙ্গে এই দেখার মুহূর্তটা কতদিন কতভাবে কল্পনা করেছে সে। কিন্তু আজ যখন সত্যিই অনিরুদ্ধদা সামনে দাঁড়িয়ে, শিবানীর ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। এখন আলো থাকলে তার মুখের ভাঙচুর চোখে পড়ে যেত অনিরুদ্ধদার। কিংবা হয়তো পড়ত না। এই এত বছরে নিজের অনুভূতিগুলোকে লুকোতে শিখে গেছে সে। তাই শিবানী অবাক হয়ে শোনে যে, একটুও গলা না কাঁপিয়ে অনায়াসে হেসে বলতে পারছে সে, "আরে আমি তো চিনতেই পারিনি। অনিরুদ্ধদা, না? কবে এলে?"

শিবানী উত্তর দেওয়ার আগেই রিকশাওয়ালা বলল, "যাবেন তো চলেন। এইখানে দাঁড়াইতে দিবে না আইজ।"

অনিরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, "তুই বাড়ি যাচ্ছিস তো?"

শিবানী মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, তুমি রিকশায় যাও। আমি হেঁটে চলে যাব।"

অনিরুদ্ধ এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। পরক্ষণেই হেসে বলল, "তার চেয়ে বরং দু'জনেই যাওয়া যাক। তোকে বাড়িতে নামিয়ে দেব। অবশ্য যদি তোর কোনো আপত্তি না থাকে।"

আপত্তি তো ছিল। একদিন যার সঙ্গে সারাটা জীবন ধরে পথ হাঁটার স্বপ্ন দেখেছিল শিবানী, আজ তার সঙ্গে এই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে সামান্য এক-দেড় কিলোমিটার যেতেও অনেক দ্বিধা, সংকোচ। ছোটো শহরে কথা হাওয়ায় ওড়ে।

একটা গভীর শ্বাস বুকে ভরে নিল শিবানী। তারপর বলল, "চলো।"

।। চার ।।

অন্ধকার গলির বুক চিরে রিকশা এগিয়ে চলেছে। অনিরুদ্ধকে আজ যেন কথায় পেয়েছে। নিজের মনেই অনেক কিছু বলে চলেছে। এত বছর শিবানীও ভেবেছে, দেখা হলে কী বলবে! কত অভিমান, অভিযোগ জমে আছে! কিন্তু আজ যখন অনিরুদ্ধ তার পাশে বসে, তার আশ্চর্য লাগছে, এত কেন অর্থহীন কথা বলছে অনিরুদ্ধ! তার চেয়ে এই মুহূর্তটা চুপ করে অনুভব করতে পারলে ভালো হত। তারাভরা আকাশের নীচে প্রিয় সান্নিধ্যটুকু এই মুহূর্তে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে শুষে নিতে চাইছে সে।

"দেখ, সেই কখন থেকে আমিই বকবক করে যাচ্ছি", বলল অনিরুদ্ধ, "তুই বল, কোথায় চাকরি করছিস এখন? আগে তো শুনেছিলাম কোনো মার্চেন্ট ফার্মে ছিলি।"

হোঁচট খেল শিবানী। কী বলবে? বলার মতো কোনো গল্প তো তার নেই। মুখটা অন্ধকার রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "একটা কর্পোরেট হাউসে। ভালো অফার পেয়ে আগের চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। নাম শুনে থাকবে— ইনফিনিটি গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড। মাস দুয়েক আগেই এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করেছি।"

নিজের প্রগল্‌ভতায় নিজেই লজ্জা পায় শিবানী। মিথ্যে বলতে গেলে বুঝি বেশি কথা স্রোতের বেগে বেরিয়ে আসে। ইনফিনিটিতে দুই মাস আগে সত্যিই গিয়েছিল সে। না, এরিয়া ম্যানেজার নয়, সাধারণ ফ্রন্টডেস্ক জবের ইন্টারভিউ দিতে। কত বড়ো অফিস! পুরোটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এ-রকম অফিসে তার নিজেরই নিজেকে বেমানান লাগছিল। চাকরিটা হয়নি। অমন ঝাঁ-চকচকে অফিসের ফ্রন্টডেস্কে তাকে মানায় না।